Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ মে, ২০১৮

৪১ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১৪ মে, ২০১৮, সোমবার, ৩০ বৈশাখ, ১৪২৫

অবাধে লুঠ, ছাপ্পা নির্বাচন— প্রহসনকেও হার মানালো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ মে : অবাধ ভোট লুঠ, ছাপ্পা, রিগিংয়ের সমস্ত রেকর্ড ম্লান হয়ে গেল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮-য়। জেলা জুড়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস ও রিগিং-এর ঘেরাটোপে ত্রিস্তর নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও ভোটদান শুরু-র ২ ঘন্টার মধ্যেই ৮০ শতাংশ ভোট পড়ে গেছে, আবার কোথাও প্রার্থী স্বয়ং ভোট দিয়ে দিয়েছেন ভোটদাতাদের। এছাড়াও মুখে কাপড় বাঁধা উন্নয়ন বাহিনী দাপিয়ে বেড়িয়েছে সমগ্র জেলা জুড়ে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় জেলা পরিষদে মোট ৫৮-র মধ্যে ৪১, পঞ্চায়েত সমিতির ৬১৮-র মধ্যে ২২২ ও পঞ্চায়েত ৩২৩৪ আসনের মধ্যে ১১৩৩টি আসনে ভোট ছিল। অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাপরিষদে ১৭-র মধ্যে ১৬, পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৬১০-এর মধ্যে ৬৬ ও গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৩৩-এর মধ্যে ৩০১টি আসনে ভোট ছিল। যা কার্যত প্রহসনকেও হার মানায়—এ বক্তব্য ভোটারদের। এর মধ্যেও কিছু প্রতিরোধের ছবি দেখা গেছে। গ্রামের মানুষ দল-মত নির্বিশেষে প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন ভোট-লুটেরাদের। সারা দিন ধরে ঘন ঘন যে লুঠ, সন্ত্রাস হামলা, ব্যালট বক্স ছিনতাই, ভোটারদের আটকে দেওয়ার খবর এসেছে তাতে আর যার যাইহোক অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ভোট বলা যায় না।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে

—এরপর চারের পাতায়

প্রহসন ভোটের প্রতিবাদ সর্বস্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা, ১০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষের মৃত্যুর প্রতিবাদে সরব হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষ। জেলার সর্বত্রই এদিন মিছিল, পথসভার মাধ্যমে ধিক্কার জানানো হয়েছে রাজ্য প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে। এদিন বর্ধমান শহরে বিকেল পাঁচটা কার্জন গেটে এক পথসভা ও মিছিল হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য নেতা অমল হালদার, পরে মিছিল হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, উদয় সরকার, তাপস সরকার প্রমুখ। গুসকরায়ও মিছিলে শামিল হন প্রতিবাদী মানুষ।

রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হল বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১০ মে : রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হল নানান অনুষ্ঠানে। আবক্ষ মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নাচে গানে প্রভাতফেরি, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনাসভার মাধ্যমে এবারে পালিত হয় ২৫শে বৈশাখ। জন্মতিথি পঁচিশে বৈশাখ হলেও পক্ষকাল ব্যাপী পালিত হয় রবীন্দ্রজয়ন্তী। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বর্ধমান রবীন্দ্র পরিষদ, বর্ধমান সংগীত সমাজ, রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর প্রভৃতির উদ্যোগে বর্ণময় রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়েছে। ৯ মে সকালে রাজবাটির নিকট জলকলের পাশে রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদানের কর্মসূচি ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের। এদিন এখানে মাল্যদান করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অরূপ চট্টোপাধ্যায়। বাচিক শিল্পী আবুল হাসান, দেবেশ ঠাকুর, কবি অংশুমান কর প্রমুখ। এদিন সকালেই বর্ধমান টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান সংগীত সমাজের কবি প্রণাম। শতাধিক শিল্পী গানে, কবিতায়, আবৃত্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। ১০ মে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান টাউনহলে। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন লেখক শিল্পী সংঘের শহর কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আবুল হাসান, রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক অনন্য ভট্টাচার্য। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে গান, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন বর্ধমানের প্রথিতযশা শিল্পীরা।

জননেতা তারাশঙ্কর সুকুলের স্মরণসভা পরিণত হল জনসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ মে : সিপিআই(এম) সর্বক্ষণের কর্মী তারাশঙ্কর সুকুল গত ২ এপ্রিল প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১। ৩ এপ্রিল তাঁর মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে বেনাচিতি বাজার বন্ধ রাখেন হকার-ব্যবসায়ীরা।

জননেতা তারাশঙ্কর সুকুল-এর স্মরণসভায় আজ বিকালে বেনাচিতি 'আনন্দধারা' হল প্রাঙ্গণে মানুষের ভিড়, জনসভায় রূপান্তরিত হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব সহ অসংখ্য মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স, লায়ন্স ক্লাব, মারোয়াড়ি সমাজ সহ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো

—এরপর চারের পাতায়

ভাঙড়ের হাফিজুর রহমান খুনের প্রতিবাদে বর্ধমানে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ মে, বর্ধমান : জমি আন্দোলনের সদস্য হতদরিদ্র ২৮ বছর বয়েসী তাজা যুবক হাফিজুর রহমান মোল্লাকে হত্যার প্রতিবাদে শামিল হয়েছে বর্ধমান জেলার মানুষও। এদিন কার্জনগেটে লালঝাণ্ডা নিয়ে সামিল বামপন্থী কর্মীরা। সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর এরিয়া-১, ও এরিয়া-২ কমিটির ডাকে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম, অপূর্ব চ্যাটার্জী এবং তরুণ রায় প্রমুখ।

ভোট লুঠ, গুসকরায় প্রতিবাদ মিছিল। ছবি : জলেশ্বর পাত্র

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কালনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ মে : কালবৈশাখীর ঝড়ে আজ সন্ধ্যায় কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। কালনা আদালত চত্বরের একটি ব্রিটিশ আমলের গাছ ভেঙে আসিফ শেখ (২৪) আইনজীবীর মৃত্যু এবং অপর এক আইনজীবী পিনাকী রায়ের পা ভেঙে গুরুতর আহত হয়েছেন। কালনা মহকুমা প্রশাসন থেকেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে বিবৃতি দেওয়া হয়। এদিন সন্ধ্যার একটু আগে কালবৈশাখী শুরু হতেই গাছপালা, কাঁচা বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়তে থাকে। মাঠের কাটা বোরো ধানের গাছ উড়ে ঝড়ের বেগে ছুটতে থাকে। পরে বৃষ্টিতে বোরো ধানের জমিতে জল জমে যায়।

কালনা আদালতের আইনজীবী পার্থসারথী কর জানান, মৃত আসিফ শেখ ও পিনাকী রায় তাদের আদালত চত্বরের সেরেস্তাতে ঝড়ের সময় বসেছিলেন। পাশেই ব্রিটিশ আমলের প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটি সেরেস্তার উপর ভেঙে পড়ে। আসিফ শেখের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়। আর পিনাকী রায়ের পা ভেঙে যায়। তাকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। মৃত আসিফ শেখের বাড়ি বৈদ্যপুরের পাতিলপাড়ায়। কালনা-১ বিডিও অফিসের নিকট এস.টি.কে.কে সড়কে উপর একটি বট গাছ ভেঙে পড়লে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানান, মহকুমা জুড়ে ক্ষয়ক্ষতির খবর আসছে। তবে কালনা আদালতের দুর্ঘটনা ছাড়া আর তেমন কোনো দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার শান্তনু চৌধুরী বলেন—আমি মন্তেশ্বরের দিকে ছিলাম। কালনা আদালতের দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কালনা আদালতের দিকে রওনা হয়েছি।

বিজ্ঞানমঞ্চের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কালনা বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে মনীষা মূল্যায়নের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কালনা পৌরসভার পুরশ্রী মঞ্চে ১১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পুরস্কার হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ২০০ জনকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। তার আগে ছাত্র-ছাত্রীরা একটি নাটক ও নৃত্য পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন—পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য আশুতোষ পাল, অশোক মুখার্জী, সঞ্জিত ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ নাগ, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস কার্ফা প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে পুরশ্রী মঞ্চ ছিল দর্শকে কানায় কানায় ভর্তি।

নতুন চিঠি

১৪ মে, ২০১৮

জমছে বারুদ-জাগছে জনতা

সেই একই ছবি। কেন এত শবসাধনা গণতন্ত্রের মহোৎসবে! তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠাত্রী হবার পর নির্বাচনী ধারাবাহিকতায়-২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনেও চিরাচরিত ভঙ্গিমায় হিংস্র নখ-দন্ত এবং দম্ভ প্রকাশ করল তাঁর দল বল। একজন বশংবদকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে এবং সংবাদ মাধ্যমে শ্রীমুখ প্রদর্শন করে তিনি নির্বাচনের প্রাক্কালে কি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন রাজ্যবাসীকে? শ্মশানের শান্তি! জনতার উত্তরও তিনি ভালোই পেয়েছেন। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর- উত্তর থেকে দক্ষিণ বঙ্গের সর্বত্র প্রতিরোধের আগুন প্রত্যক্ষ করা গেল। স্বাভাবিকভাবেই এই মৃত্যু, এত রক্তস্রোতের দায় শাসকদলের নেত্রী নেবেন আশা করা যায় না। প্রতিরোধের আগুনে শাসকদলের কয়েক জন স্বয়ম্ভুরও মৃত্যু তাঁকে ব্যাথিত করে কিনা জানা নেই। তবে আগুন, পুড়িয়ে হত্যা, ব্যালট ছিনতাই, ব্যালট বাক্স লুট, ব্যালট বাক্স পুড়িয়ে দেওয়া-জলে ফেলে দেওয়া, বাক্সের ভিতরে কালি বা জল ঢেলে দেওয়া, ভোটকর্মীদের বসিয়ে রেখে ভোটপর্ব সারা, এমনকি হিসেব কষে শাসকদলের ব্যালটে ছাপ্পা দিয়ে বাক্সে পুরে দেওয়া ইত্যকার- সব ঘটনাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন চোখে দিয়েছে ঠুলি, কানে দিয়েছে তুলো। শাসকদলের মন্ত্রী-সান্ত্রী সব সেনাপতিরা এলাকায় এলাকায় ঘুরে নির্বাচন পরীক্ষকের ন্যায় ভোটপর্ব সঠিকভাবে শাসকদলের পক্ষে সারা হচ্ছে কিনা তাও পরিচালনা করছেন যা দেখা গেছে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায়।

তাই গণতন্ত্রের মাশুল গুণতে হল রাজ্যবাসীকে। ৮ জেলায় ১৯ জনের মৃত্যুর খবর আপাতত শিরোনামে। শাসকদলের দুষ্কৃতীবাহিনীর হাতে ৫ জন সি পি আই (এম) কর্মী সমর্থক সহ ১২ জন খুন হয়েছেন। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে হিংসার তাণ্ডব চালাতে গিয়ে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের আগুনে রেহাই পায়নি শাসকদলের দুষ্কৃতীরাও। অন্তত ৭জন তৃণমূল কর্মী সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। ২০১১ সালের পর সম্ভবত এই প্রথম প্রতিরোধের আগুন দেখল শাসকদল। হাবড়া, রায়গঞ্জ, নাকাশিপাড়া, শান্তিপুর, তেহট্ট একের পর এক জায়গায় জনগণের মারমুখী চেহারা। কোথাও শাসকদলের সশস্ত্রবাহিনীকে তাড়া করেছেন মানুষ, কোথাও তাদের ঘিরে ফেলে গণধোলাই চলেছে, কোথাও বা কুপিয়ে একেবারে শেষ! কোথাও শাসকদলের বিক্ষুব্ধদের বোমা গুলিতে প্রাণ গিয়েছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকের। এত রক্তস্রোত কেন? চারদিকে উন্নয়ন যখন আকাশে উঠেছে, তখন দলনেত্রীর সিংহাসনকে অটুট রাখতে এত শবসাধনা কেন? জনতা জাগছেন, জমছে বারুদ, আঁচ পেয়েছেন কি তিনি? তাই কি তলে তলে বিজেপি'র হাতে রাজ্যটি উপহার দেওয়ার জন্য পরোক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসন কামনা করছেন আবার অন্যদিকে সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করতেও সংশয়! তাই বালখিল্যের মতো মহাসচিবের দাবি, সারা দিন বাংলার মানুষ উন্নয়নের উদ্‌যাপন করল ভোটদান করে!

উন্নয়ন উদ্‌যাপন! মৃত্যুর সংখ্যা এবং তারমধ্যে ক'জন শাসকদলের— এই বিবরণ প্রচারেই উন্মুখ তিনি। আশ্চর্য! পরক্ষণেই আবার নবান্ন থেকে রাজ্য কোটালের মুখেও শোনা যায় একই বাণী।

তবে যাই হোক গণতন্ত্রের মহোৎসব ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসন বলতেও লজ্জা হবে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষকে উন্নয়ন ও প্রশাসনের অংশীদার করা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের সাফল্য নিয়ে দেশ বিদেশে বহু গবেষণা হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার গর্ব ছিল বাংলার, আজ তা ভূলুণ্ঠিত।

হায় রে গণতন্ত্র! জমছে বারুদ-জাগছে জনতা, সাধু সাবধান!

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কোন বঙ্গাব্দের কোন তারিখে জন্ম? মৃত্যু কবে?
২. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কোন সালে সাহিত্যে নোবেল পান?
৩. সুদূর স্টকহলম থেকে সংবাদ সংস্থা রয়টারের ছোট্ট টেলিগ্রাম কবে ছাড়া হয়েছিল? সেই টেলিগ্রাম রবীন্দ্রনাথ কবে হাতে পান?
৪. 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজি কাব্যগ্রন্থটি কবে কোথা হতে প্রকাশিত হয়? এই কাব্যগ্রন্থে কতগুলি কবিতা ছিল?
৫. 'গীতাঞ্জলি' বাংলা কাব্যগ্রন্থটি কবে কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? দাম কত ছিল?
৬. রবীন্দ্রনাথ যখন 'গীতাঞ্জলি' রচনা করছেন, তখন তাঁর তিন প্রিয়জন মারা যান, কারা ছিলেন?
৭. কত সালে কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম লন্ডন যান?
৮. লন্ডনে কার বাড়িতে থেকে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করেন? এবং বিশিষ্টদের কাছে কবে তা পাঠ করেন?
৯. 'এ মনিহার আমায় নাহি সাজে'—এই গান রবীন্দ্রনাথ কবে লিখেছিলেন?
১০. রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পদক ও পুরস্কার কবে দেওয়া হয়? স্টকহলম থেকে কে সেই পদক ও পুরস্কার গ্রহণ করেন?
১১. রবীন্দ্রনাথের হাতে সাহিত্যে নোবেল পদক ও পুরস্কার কোথায় কে কবে তুলে দিয়েছিলেন?
১২. কবে কোন ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

অন্য রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নন, বিশ্বব্যাপী বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর অসাধারণ মনীষা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণী ক্ষমতা আপাত-র অন্তরালবর্তী অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নিগূঢ় সত্যকেই উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে পর্বে পর্বে মানব সমাজ ও সভ্যতা এগিয়েছে। এককালে মানুষ যা নিয়ে কাজ চালিয়েছে চিরদিন তাই নিয়ে চলবে, মানুষের ইতিহাস এমন কথা লেখে না। মানুষের বুদ্ধি যুগে যুগে নূতন উদ্‌ভাবনার দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে। (র. র. ১৩/৪৩২) কর্মিকরাই তাদের কর্মশক্তির সাহায্যে সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেছে। হাতের সঙ্গে হাতিয়ারকে মিলিয়ে সে তার কর্মক্ষমতাকে ক্রমশ প্রসারিত করেছে। (র.র. ১৩/৪১৭) অরণ্যচারী মানুষ ব্যক্তিগত খাদ্যসন্ধানের স্তর পেরিয়ে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার ফলে বহু লোকের অন্ন হয়ে ওঠে বহু লোকের সমবেত উৎপাদন। "অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল।" (র.র. ১৩/৪২৪) কৃষির উদ্বৃত্ত থেকে নগর গড়ে ওঠে এবং গ্রামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। গ্রামগুলি ছিল প্রাণের ক্ষেত্র, আর নগরগুলি গড়ে ওঠে দেশের শক্তির ক্ষেত্র হিসাবে। সেখানে সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতাই মুখ্য। (র.র. ১৩/৪২৯) "যত-কিছু সুবিধা সুযোগ, যত-কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জিত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো অন্ন যোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনোমতে জীবনধারণ করে মাত্র।" (র.র. ১৩/৪২৯) প্রসঙ্গত তিনি প্রাচীন গ্রিসের দাস ব্যবস্থা ও ইতালির শক্তি-সাধনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ তার কর্মশক্তিকে বাড়ায়, ধন উৎপাদনের জন্য তাই বিজ্ঞান তথা যন্ত্রের সাহায্য নিতেই হবে। কিন্তু "শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ একজন বা একদল মানুষ কোনো সুযোগে নিজের হাতে নেয়, তখনই বাকি লোকদের মুশকিল ঘটে। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়; তাতে ক্ষুদ্র বিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।" (র.র. ১৩/৪২৯) এরই ফল 'ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব' (র.র. ১৩/৪২০), 'কর্মিক ও ধনিকে বিরোধ' (র.র. ১৩/৪৩১)।

সভ্যতার এই শোষণজীবী চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর কথায়, 'ধনের ধর্মই অসাম্য।... ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।" (র.র. ১৩/২২৫) "ইংরেজিতে যাকে বলে এক্সপ্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই।" (র.র. ১৩/৪২৯) এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (Parasite)। তাই শুধু ধনের অর্জন নয় ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। (র.র. ১৩/৪২৯) যারা ধন অর্জন করেছে এবং যারা অর্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ মিটছে না। (র.র. ১৩/৪৩০)

১৯১৪ সালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রচিত 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ধনিক সভ্যতাকে 'বশ্যরাজকতন্ত্র' আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন, "শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে। ...এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটি যাঁতা মানুষের আর সমস্ত গুড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ...ও দেশের শ্রমজীবী মানুষের দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্প-সল্প এটা ওটা দিয়া কোনমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা।" (র.র. ১৩/২২৫) পাশ্চাত্য ধনবাদের মূল বৈশিষ্ট্য—তার শ্রেণিভিত্তি ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব, তার শ্রম-শোষণ ও প্রতারণা এবং অমানবিক অসাম্য এই উক্তিটির মধ্যে ধরা পড়েছে।

ধনবাদী শোষণের অর্থনৈতিক চরিত্রটিও রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সঠিকভাবেই ধরা পড়েছে। তাঁর কথায়, মূলধন মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। বহুলোকের 'কর্মশক্তি'কে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব।

একেই ইংরেজিতে বলে এক্সপ্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি। 'কর্মশক্তি' শব্দটির প্রয়োগ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা মূলধনের মধ্যে যে শ্রমের পুঞ্জীভবন ঘটে তা শ্রমিকের নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু শ্রম শোষণ করে সম্ভব নয়, তার পূর্ণ শ্রমশক্তির যৎপরোনাস্তি শোষণের মাধ্যমেই সম্ভব। (র.র. ১৩/৪৩৩) শ্রম ও শ্রমশক্তি তথা 'কর্মশক্তি'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই পৃথকীকরণ মার্কসীয় বিশ্লেষণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পণ্য-উৎপাদন (Commodity production) প্রক্রিয়ায় কারখানার মালিক যে শুধু শ্রমিকের শ্রম (labour) নয়, তার শ্রমশক্তি (labour power) শোষণ করে এবং তজ্জাত উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) দিয়ে মূলধন (capital) সৃষ্টি করে সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি এখানে স্পষ্ট।

ধনবাদী আর্থব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমেরিকা যুক্তরাজ্য এই ডিমোক্রেসির বড়াই করে। কিন্তু যেখান মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমোক্রেসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। ...টাকার জোড়ে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।" (র.র. ১৩/৪২১)। ধনবাদী বিকাশের একটি পর্যায়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণের অনিবার্য তাগিদে ধনবাদ কীভাবে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় এবং বিশ্বকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এই প্রবন্ধে একজন প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি তা লক্ষ করেছেন। ভোজসভায় দেরিতে উপস্থিত হওয়া জার্মানির অন্যের পাত কেড়ে খাওয়ার রূপকল্পে দেরিতে সাম্রাজ্যবাদের উত্তীর্ণ জার্মানির আত্মবিস্তারের ক্ষুধাকেই চিহ্নিত করে তিনি বলেন, "কিন্তু জর্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল, সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।"

সোভিয়েত বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে, ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের উল্লেখ করে বলেছেন, 'বৈষম্য হইতেই বিপ্লবের সৃষ্টি।" শ্রেণিসংগ্রামের কথাই যেন আভাষিত হয় ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর ৭ পৌষের ভাষণে : "ধনিকের স্বার্থজাল আজ সমস্ত জগতকে বেষ্টন করেছে। এই স্বার্থ যতই প্রবল হয়ে উঠচে এই স্বার্থের সংঘাতও ততই ভয়ংকর হয়েছে। ...বাঁধ ভাঙবেই; সে বাঁধ আরো বড়ো করে বাঁধতে গেলে আরো বড়ো রকমের প্রলয়ের মধ্যেই ভাঙবে।" (মুখোপাধ্যায়, ৩/৩৭-৩৮)

'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "ইহার পর আর একটি লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজন মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।" (র.র. ১৩/২৩০) অর্থাৎ ধনতন্ত্র উত্তীর্ণ হবে এমন এক ব্যবস্থায় যেখানে শূদ্র তথা মজুরের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। একে সমাজতন্ত্র হিসাবে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেননি। তিনি রাজনৈতিক তত্ত্বপ্রণেতা ছিলেন না, সমসাময়িক বিশ্বের ঘটনাবলীর মধ্যে যে প্রবণতা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল ভারতীয় বাগ্‌ধারায় তাকেই তিনি প্রকাশ করেছেন। তবে ধনবাদের নিখুঁত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় হন যে আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। আজ নির্ধনকেই বললাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে। (র.র. ১৩/৪৩৩)

ভবিষ্যতের ইতিহাস যে রচনা করবে শ্রমজীবী মানুষই, রাশিয়া-দর্শনে ঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়ের এক প্রতীকী উপস্থাপনা আমরা পাই ১৯৩২-৩৩ সালে রচিত 'রথির রশি' নাটকে, যেখানে শূদ্ররা এসে রশিতে টান দিতেই অনড় মহাকালের রথ বিপুল বেগে চলতে শুরু করে। শূদ্রদলপতি সোচ্চারে জানায়, 'আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ—আমরাই বুনি বস্ত্র, তাই তোমাদের লজ্জারক্ষা।' মন্ত্রীর বোধোদয় হয়, সে বলে, 'নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।' সেই যুগান্তরের শরিক হতে সেও ছোটে শূদ্রদের সঙ্গে রশি ধরতে। কবি চরিত্রের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন বলে ওঠেন : 'যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার তা ছাই হয়, যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।"

১৯৩৫-এর ৭ মার্চ কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন : "সভ্যতার...ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। ...নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান।" রাশিয়া ভ্রমণের পর তাঁর অভিমত জানতে চেয়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের এক টেলিগ্রামের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, "Your

—এরপর চারের পাতায়

রেনেসাঁস-এর আলোয় রবীন্দ্রনাথের নাটক বিসর্জন

রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জী

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটক প্রকাশ করেন। মধ্যযুগের গোলক থেকে বেরিয়ে জীবনধারার মৌলিক স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তবু মধ্যযুগীয় চেতনার প্রকাশ রেখেছেন। সময়ের সাথে সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ন্যায়, নীতি-প্রভৃতির পরিবর্তন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল নবযুগের পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের গীতিধারায় মানুষ নিজেকে বদলে ফেলেছে। বদলে ফেলার ইতিহাস 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিসর্জনে' উঠে এসেছে।

'বিসর্জন' নাটকের প্রথমে দেখতে পাই পশুবলি বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা। এই পশুবলি বন্ধের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় ধর্মবোধ ও দর্শন বিরোধী মূল্যবোধের প্রকাশ। সমাজে সহজ চলার পথে সংগ্রামের ছবি উঠে আসে। নানা বিরোধ প্রতিরোধ, সংগ্রাম, চক্রান্ত, হিংসা, মমত্ববোধ, স্নেহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনচিত্র সামনে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজির অনুপ্রবেশ পুঁজিপতির আবির্ভাব, শ্রমশক্তির বিকাশ হয়েছিল। মধ্যযুগে পুরাতন শক্তির আড়ালে এই নব্যশক্তি এগিয়ে এসেছিল, বিসর্জন নাটকে দুই শক্তির দ্বন্দ্বময় গতিধারা প্রবাহিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধ, ধর্মান্ধতার পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের সন্তানহীন রানীর কান্নাকে তুলে ধরতে চাননি, তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন নতুন যুগের আদর্শবোধকে।

নতুন যুগকে আদর্শ করে মানুষ ধর্মান্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, তার প্রমাণ—

"মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে।"

অপর্ণার ভর্ৎসনায় নতুন যুগের উন্মেষের দাবি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

অপর্ণা! "মা, তুমি নিয়েছ কেড়ে দরিদ্রের ধন!
রাজা যদি চুরি করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে
জগতের রাজা, তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার! মহারাজ বলো তুমি"

অপর্ণা এখানে রেনেসাঁস উদ্ভাসিত জীবনবোধ ও দর্শনের পরিচয় দিয়েছে। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ মধ্যযুগে দেবীর উদ্দেশ্যে বলি ও রক্তপাতে মাতোয়ারা থাকতো। রবীন্দ্রনাথ এই নীতিবোধকে মেনে নিতে পারেননি, তাই নতুন জীবন বোধ, নতুন চিন্তা-চেতনাকে জন্ম দিয়েছেন।

"করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর"

পুরাতনের ধ্বংসস্তূপে নতুনের জন্ম হয়। কিন্তু মানুষের মনে পুরাতনকে সরিয়ে নতুনকে গ্রহণ করার দ্বন্দ্ব বর্তমান। রঘুপতি রাজপুরোহিত ও সমাজে ধর্মের কাণ্ডারি। কিন্তু রাজপুরোহিত সমাজ পরিবর্তনের প্রতিপালক! রঘুপতি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিপালক। নব্য পুঁজিবাদ ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে নতুন যুগের সূচনা করে দিয়েছে। রঘুপতি পরিবর্তনের নতুন যুগকে মেনে নিতে পারেনি। যুক্তি, বুদ্ধি, চক্রান্তের নেশায়, সে মেতে উঠেছে। তাই রেনেসাঁস চিহ্নিত পশুবলিকেন্দ্রিক জীবনবোধকে মেনে নিতে পারেনি, বরং জেহাদ ঘোষণা করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নব্য জীবনের গতিধারাকে মেনে নেয়নি।

নাটকে রাজা গোবিন্দমানিক্যর জীবনে শূন্যতা রেনেসাঁসের জীবনকে তুলে ধরে। রাজা, অপর্ণা, জয়সিংহ, নতুন সমাজ, নতুন ধর্ম, এবং নতুন যুগের প্রতীক। গুণবতী, রঘুপতি, নক্ষত্ররায় প্রতিক্রিয়াশীল জীবন ভাবনার শরিক। জয়সিংহের আত্মবলিদান নতুন যুগের গতিসঞ্চার করে। সামন্ততন্ত্রের ধর্মান্ধতাকে ধিক্কার জানায়। নাটকে পশুবলি শুধু বন্ধ হয়নি। দেবীকে গোমতীর জলে বিসর্জিত হতে হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিউদারতা নাটককে অন্য মাত্রা দিয়েছে

২৯ আগস্ট ১৯২৩ (১২ ভাদ্র বুধবার ১৩৩০) আনন্দবাজার পত্রিকায় 'অতীতের পৃষ্ঠা বিভাগে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ের প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

"আমরা কাল এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। 'বিশ্বভারতী'র সাহায্যকল্পে অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল এবং প্রধানত উহারই ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকেরা প্রধান প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ের সাজসজ্জা বিশেষত বর্ণসমাবেশ, উচ্চ শিল্পকলার পরিচায়ক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের চরিত্রে লোকাচার ও ধর্ম, অন্ধবিশ্বাস ও মানব হৃদয়ের মধ্যে পদে পদে যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে তাহা মূর্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছিল। এরূপ উচ্চাঙ্গের অভিনয় কলা দর্শনের সৌভাগ্য সকল সময় হয় না। রাজার ভূমিকায় কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের অভিনয় উল্লেখ করিতে হয়।"

আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের বক্তব্য—"পাশ্চাত্য কোন কোন নাটকে রাজশক্তির সহিত পুরোহিতশক্তির যে সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, রঘুপতির পরিকল্পনা সেই শ্রেণির পুরোহিতশক্তি হইতে আসিয়াছে। ইহা যেন আমাদের সমাজে এক অভিনব শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রঘুপতি রাজার রাজ্যে বাস করিয়াও তাঁহার সমান শক্তিলাভের অভিলাষী। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসে পুরোহিত শক্তির এমন ঔদ্ধত্যের পরিচয় খুব সুলভ নহে, সেইজন্য রঘুপতির চরিত্র পরিকল্পনায়, যে পাশ্চাত্য প্রেরণাই কার্যকরী হইয়াছে তাহা অনুমান করিতে ভুল হয় না।"

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-এর আলোয় আলোকিত। পুরাতন অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নতুনের পথে পথচলা। যা নাটকটিকে অন্য মাত্রা এনে দেয়।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) শ্রী অশোক সেন, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, তৃতীয় সংস্করণ বইমেলা ২০০০, এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।
২) অনুত্তম ভট্টাচার্য, রবীন্দ্ররচনাভিধান, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৯, দীপ প্রকাশনা, কলকাতা।
৩) আশুতোষ ভট্টাচার্য, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা।
৪) গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা) ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫, প্রথম প্রকাশ ২০০১, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।

ভোজন-রসিক রবীন্দ্রনাথ

কল্যাণী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর বহুবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তো কত বছর হয়ে গেল। তবুও তো ২৫শে বৈশাখের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে আমাদের কাছে ফিরে ফিরে আসেন। গানে গানে আমরা তাঁকে স্মরণ করি। পত্র-পত্রিকায় আমরা কবিকে খুঁজে বেড়াই। বহুকাল ধরে বহু মানুষ কবিকে নানা রূপে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসায়, মননে, স্মরণে কবির নব নব রূপে ফিরে ফিরে আসা।

আজকের ছোট্ট পরিসরে সেই সব গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা নয়। আমরা খুঁজতে থাকি ভোজন-রসিক রবীন্দ্রনাথকে। 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া', 'প্রহাসিনী' ও 'ছড়া'র বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথের আর এক রূপ। যিনি খুব সহজেই বলতে পারেন 'এত বুড়ো কোনকালে হব নাকো আমি/হাসি- তামাসারে যবে কব ছ্যাবলামি'। কবির জীবনেও মাঝে মাঝে কৌতুকের ছেলেখেলা এসেছে। হালকা হাসিকে তিনি মনে করেছেন দেবতার দান। মানুষের জীবনে খাওয়া-দাওয়া একটা বিরাট ব্যাপার। 'ভোজনের প্রসঙ্গ' কবিতায় এসেছে অনেক কবিরই লেখনীতে, সেই ঈশ্বরগুপ্তের কাল থেকে তার চলন। রবীন্দ্রনাথও যে কখনো কখনো সে পথে চলেছেন তার একটু উদাহরণ দেওয়া যাক—'লঙ্কা আনো, সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত/গন্ধে তার হয়োনা শঙ্কিত/আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো/ঘন্ট আর ছেঁচকি রাঁধো। খাওয়ার ব্যাপারে উদার হয়ে এগোতে হবে কারণ "ওজন করি ভোজন করা তাহারে করি ঘৃণা।"

আর একটি মজার কবিতা তুলে ধরছি। কত বড় কবি তিনি, সমাজ-সংসারের কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে। সেই কবির মেয়েদের গৃহস্থালি ও রান্নাবান্নার দিকে কী গভীর পর্যবেক্ষণ। (মেয়েরা) ধরফরে জ্যান্ত মাছ কোটে/দুই হাতে ল্যাজামুড়ো জাপটিয়ে ধরে/সুনিপুণ কবজির জোরে। ছাই পেতে বটির উপরে চেপে বসে! কোমরে আঁচল বেঁধে কষে/কুটি কুটি বানায় ইচোর/চাকা চাকা করে থোর /আঙুলে জড়ায়ে তার সূতো? মোচাগুলো খস্‌খস্ কেটে চলে দ্রুত।' শুধু কি তাই? 'গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি' তার নজর কারে। ঈলিশের ডিম ভাজার কথাও তিনি লিখেছেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বাংলার ঘরে ঘরে ভাই বোনের উৎসব। এই উৎসবের দিনে 'বড় থালা কাংসের/মৎস ও মাংসের/কানায় কানায় বোঝা হয়ে গেল পূর্ণ।' আবার 'পরিণয় মঙ্গল' কবি নব পরিণীতাকে আশীর্বাদ করেছেন : 'পাক্‌প্রণালীর মতে কোরো তুমি রন্ধন/জেনো ইহা প্রণয়ের সব সেরা বন্ধন।' সব চাইতে অবাক লাগে কবি যখন বলেন, "জানো বাসনার সেরা বাসা রসনায়।" শান্তিনিকেতনে চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষ্যে লিখেছেন : চা স্পৃহ চঞ্চল, চাতকদল চল/চল চল হে।

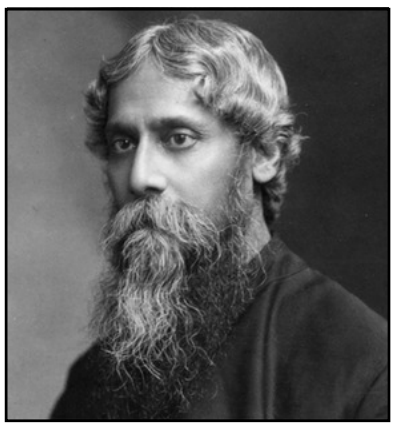

আবার কৌতুক করে খাওয়া সম্পর্কে লিখেছেন, "ভাজনে ওজন অতি কম, নাই রুটি নাই আলুদম। নাই রুই মাছের কালিয়া"। তবে কবি কী দিয়ে পেট ভরাবেন? তারও উত্তর দিয়েছেন, "দুপেয়ালা Chinese Tea-এ আধাসের দুগ্ধ ঢালিয়া।" প্রহাসিনী কাব্যের পলাতকা কাবিতায় কত না খাবারের নাম : কলা, টোস্ট, গুড় মাখানো পুলিপিঠে, প্যারাকি কত না নাম!

নারীর কোন রূপকে কবি স্মরণ করবেন? যে কবি তাঁর মানসী প্রিয়াকে কত রূপে কতভাবে দেখেছেন তিনিই তো আবার বলেন, 'বল কোন ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত/মালতী জড়িত বঙ্কিম বেণী ভঙ্গিমা/দ্রুত অঙ্গুলে সুরঝঙ্কার ঝঙ্কৃত/শুভ্র ধারাটি প্রান্তধারার রক্তিমা/... অথবা ডালিটি দাড়িমে, আঙুরে সজ্জিত/কিম্বা থলিটি থরো থরো ভরা সন্দেশে।'

কত আর উল্লেখ করব। এই সব কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আর এক রূপ। যে কবি একদা বলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নির্মল শুভ্র সংযত হাস্যরস প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের কবিতায় তো সেই হাসির দেখা মেলে। স্যাটায়রের নির্মম কশাঘাত না করে, উইটের বাকবৈদগ্ধ্য না ছড়িয়ে অনাবিল আনন্দের হাসি তিনি পাঠককে উপহার দিয়েছেন। এ যেন আর এক রবীন্দ্রনাথ—যিনি আমাদের কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন।

স্মৃতির মণিকোঠায় অশোক মিত্র

জয়তী ঘোষ : ১৯৯২ সাল। আমি তখন বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের এম.এ. ক্লাসের ছাত্রী। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয় দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। আমরা সবাই গেছি তাঁর বাড়িতে। তাঁর মাথার কাছে বসে আছেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র অশোক মিত্র। সেই প্রথম তাঁকে এত সামনে থেকে দেখা। সেখান থেকে সবাই মিলে শেষযাত্রায় সামিল হলাম। অনেকটা হাঁটা পথ। অশোক মিত্রর তখন শরীর ভালো যাচ্ছিল না। বারবার আমরা ওনাকে অনুরোধ করেছিলাম একটা রিক্সায় ওঠার জন্য। উনি শুধু একটু হেসে বলেছিলেন "না না আমি তোমাদের সঙ্গে হেঁটেই যাব"। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর মনের জোর ও দৃঢ়তা দেখে।

এরপর শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন আরও দুবার দুটি সেমিনারে তিনি এসেছিলেন। ওনাকে দেখাশোনার দায়িত্ব থাকত আমাদের উপর। খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন। তাই একটু ভয়ে ভয়েই থাকতাম। কিন্তু ঐ আপাত কঠিন মানুষটার পিছনে অসম্ভব অনুভূতিপূর্ণ, সহৃদয়, ছাত্রবৎসল মানুষটিকে বারবার দেখেছি আর শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করেছি।

এরপর ১৯৯৪-৯৫ সাল। বর্ধমান 'নতুন চিঠি' পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য অশোক মিত্র লেখা দেবেন। বিষয় ছিল তাঁর ছাত্রজীবন এবং সেই সময়ের ছাত্র আন্দোলন। কিন্তু তাঁর লিখতে খুব অসুবিধা হয় বলে কাউকে একটা তাঁর হয়ে লিখে দিতে হবে। পত্রিকার সম্পাদক আমার বাবা। সেই লেখার গুরুতদায়িত্ব পড়ল আমার আর জয়জিতের উপর।

সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। উনি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন। কোথাও থামা নেই। হোঁচট খাওয়া নেই, ভাষার সাবলীলতায় একটুও ঘাটতি নেই। একদিকে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি আর অন্যদিকে তাঁর সঙ্গে তাল মেলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। তিনি মাঝে মাঝে চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করছেন বেশি তাড়াতাড়ি বলছি না তো?" কি বলব? একজন অর্থনীতির অধ্যাপকের ভাষার প্রতি এই দখল দেখে মুগ্ধ, বিস্মিত হয়ে গেছি। একবার নয়, বার বার।

শেষ হল লীগ পর্যায়ের যুব ক্রিকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ৭ মে : কালনা পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর উদ্যোগে শেষ হল চারদিনের লীগ পর্যায়ের যুব ক্রিকেট। মোট আটটি দল লীগ পর্যায়ে সাতটি করে খেলে পয়েন্টের হিসাবে ফাইনালে ওঠে সানরাইজ ক্লাব এবং গুড অফ বেস্ট টাইম ক্লাব। এই দুই দলের মধ্যে আজ চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় জয়ী হয় গুড অফ বেস্ট টাইম ক্লাব। দুই দলের হাতে জয় বিজয়ের পুরস্কার তুলে দেয় ডি ওয়াই এফ আই নেতা নেপাল সরকার।

শিক্ষক নেতার জীবনাবসান

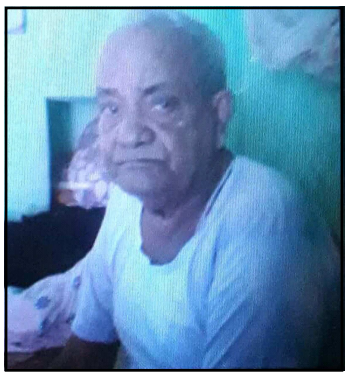

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ১৩ মে : প্রবীণ শিক্ষক নেতা কানাইলাল ব্যানার্জী (৮১)-র জীবনাবসান হয়েছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় গতকাল রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিন কন্যা ও নাতি-নাতনি, জামাইদের তিনি রেখে গেছেন। তাঁর মৃতদেহ কালনার বাড়িতে পৌঁছলে আজ সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতবৃন্দ। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, কালনা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, কেশব ঘোষ, স্বপন ব্যানার্জী, সঞ্জিত মুখার্জী, দিলীপ দত্ত, আলোক রায় প্রমুখ। এদিনই কালনা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়। ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট অনুরাগী হয়ে ওঠেন। পরে পড়াশুনা শেষ করে ইছাপুর শ্রীগদাধর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। একদিকে তিনি শিক্ষক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক আন্দোলনেরও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে অবিভক্ত পার্টির সদ্যপদ লাভ করেন। তাঁর দুই ভাই সঞ্জীব ব্যানার্জী, ললিত ব্যানার্জী এখনো সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে যুক্ত আছেন।

অন্য রবীন্দ্রনাথ

—তৃতীয় পাতার পর

success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity." (মুখোপাধ্যায়, ৩/৪১৭) ১৯৩৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইংলন্ডের Manchester Guardian পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার দেবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সমুচ্চ প্রত্যয় : "The future lies in our learning to ally ourselves with those human forces in the world, wherever found, which are seeking to end altogether the exploitation of man by man and of nation by nation." রাশিয়ার অভিজ্ঞতা, তার নেতিবাচক দিকগুলি সত্ত্বেও, রবীন্দ্রজীবনের শেষ দশকটিকে সত্যিই একটি অন্য মাত্রায় উন্নীত করে। জমিদারির উপর আর ভরসা রাখা চলবে না, একথা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে (৩১ অক্টোবর, ১৯৩০) তিনি বললেন, "ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েচে।"

ক্ষুদ্রতর গণ্ডি থেকে বৃহত্তর গণ্ডিতে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়াই রবীন্দ্রজীবনের গতিসূত্র। ইন্দিরা দেবীর কাছে নিজের মনটি খুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : চেষ্টা করছি অন্তরের দিকে নূতন পালা আরম্ভ করতে। সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন। যাদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ একের পর এক সভ্যতার ভিত্তি রচনা করে চলেছে সভ্যতার সেই পিলসুজ-দের থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কখনোই সরেনি। 'পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে'—এই সুগভীর প্রত্যয় নিয়েই রবীন্দ্র-জীবনের অবসান ঘটে।

তথ্যসূত্র : ১) রর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৮) রবীন্দ্র রচনাবলী এবং পরের সংখ্যাদুটি খণ্ড/পৃষ্ঠা নির্দেশ করছে। (২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'র নির্দেশক—মুখোপাধ্যায় খণ্ড/পৃষ্ঠা।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সুদীপ কর্মকার পিতা জয়দেব কর্মকার, জৌগ্রাম থানা জামালপুর জেলা পূর্ব বর্ধমান। নেটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম হল সুদীপ হালদার, জন্ম তারিখ ১০.০৬.১৯৯৭। আধার কার্ড, ভোটার পরিচয় পত্রে আমার নাম সুদীপ হালদার ও এইচ ডি এফ সি স্ট্যান্ডার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পলিসি নং 11769080-তে আমার নাম সঞ্জীব কর্মকার নথিভুক্ত হয়েছে। সুদীপ কর্মকার ও সঞ্জীব কর্মকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১.১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ, মৃত্যু ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। ২. ১৯১৩ সালে। ৩. ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর। ১৬ নভেম্বর। ৪. ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর, লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে, ১০৩টি। ৫. ১৯১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১ টাকা। ৬. পুত্র শমী, কন্যা রেণুকা এবং স্ত্রী মৃণালিনী দেবী। ৭. ১৯ বছর, ১৮৭৯ সালে। ৮. উইলিয়ম রোথেনস্টাই, ১৯১২ সালের ৩০ জুন। ৯. ১৯১৩ সালের ২৪ আগস্ট। ১০. ১৯১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর স্টকহলমে, ব্রিটেনের চ্যাজ ডি অ্যাফেয়র মিঃ ক্লাইভ। ১১. কলকাতার লাটভবনে, বাংলার গভর্নর কারমাইকেল, ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। ১২. ১৯১৯ সালের ২৯ এপ্রিল, ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে।

প্রবীণ নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ মে : প্রবীণ শিক্ষক নেতা অবণীভূষণ ভট্টাচার্য (৮৩)-র জীবনাবসান হয়েছে। মন্তেশ্বর থানার দেনুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতুন গ্রামের বাড়িতে আজ ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী, চার ছেলে, তিন মেয়ে, পুত্রবধূ, নাতি নাতনি বর্তমান। খবর পেয়েই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসেন সিপিআই(এম) নেতা কর্মী ও অসংখ্য অনুরাগী। তাঁর মৃতদেহ লাল কাপড়ে মুড়ে দেন প্রবীণ পার্টি নেতা মদন রায়। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, দলের মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি সরকার, হামিদ শেখ, সুশান্ত মণ্ডল প্রমুখ। কাটোয়া শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ষাটের দশকে কৃষক ও শিক্ষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রয়াত অবণীভূষণ ভট্টাচার্য পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭৭ সালে তিনি দলের সদস্যপদ লাভ করেন। সেই থেকেই আমৃত্যু তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন।

পরিণত হল জনসভায়

—প্রথম পাতার পর

হয়। সিপিআই(এম) দুর্গাপুর পশ্চিম-১ এরিয়া কমিটির পক্ষে আয়োজিত এই স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, রথীন রায়, জীবন রায়, সন্তোষ দেবরায়, সাইদুল হক ও সুদেব রায় (ভারতের জাতীয় কংগ্রেস)। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন মহাদেব পাল। সঞ্চালনা করেন মহাব্রত কুণ্ডু।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মদন ঘোষ বলেন, আজ রাজ্য ও দেশে যখন গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত নেমে আসছে, সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপাদাপি চলছে, তখন তারাশঙ্কর সুকুল-এর সংগ্রামী জীবন চর্চা ও পার্টির বিকাশের সর্বস্ব পণ আমাদের পথ দেখাবে। গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী বলেন, পার্টি অফিসে লড়াকু জীবন কাটিয়ে মেহনতি মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করা চরিত্রগুলি বিরল হয়ে আসছে। নয়া প্রজন্মের নেতৃত্বকে তারাশঙ্কর সুকুল-এর মতন নেতৃত্বের জীবন ধারা বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রহসনকেও হার মানালো

—প্রথম পাতার পর

বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটদান শুরু হতেই পূর্বস্থলীর বিভিন্ন এলাকা জুড়ে শুরু হয়ে যায় বাহিরাগত বাইকবাহিনীর তাণ্ডব। একটার পর একটা বুথ দখল করে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভোটারদের সেখান থেকে বের করে দেয়। ভোট কর্মীদের বসিয়ে রেখে ছাপ্পা ভোট দিয়ে তারা চলে যায়। অধিকাংশ বুথে ছাপ্পা ভোট দিয়ে বাইক বাহিনী বেরিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভোটারদের মধ্যেও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নির্বাচন কমিশন মানুষের ভোটদানে সুরক্ষা দিতে না পারায় সাধারণ ভোটাররা বিক্ষুব্ধ হয়ে বুথে ঢুকে ব্যালট বক্সে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনা ঘটেছে পূর্বস্থলী-২ ব্লকের ১১৯ নং বুথ) পদ্মবিল পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়), ১০৯ নং বুধ (স্বরগডাঙা অবৈতনিক বিদ্যালয়), এবং ৬৯ নং বুথ (চাঁদপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র)। তবে ৬৯ নং বুথে সাধারণ ভোটার নির্বাচন কমিশনের উপরেই ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। এখানে বাইক বাহিনীরও প্রতিরোধ করেছে। এই প্রতিরোধে বাইক বাহিনী তিনটি বাইক ফেলে পালাতে বাধ্য হয়। তিনটি বাইকেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ক্ষুব্ধ মানুষ। তারপরই বাহিনী পূর্বস্থলী ছেড়ে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিটি বুথে ছাপ্পা ভোট দিয়ে চলে যাওয়ার সময় অনুব্রত-র নামে জয়ধ্বনিত দিচ্ছিল।

অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্বস্থলীর বিভিন্ন বুথের দখল নিতে আগের দিনই আমদানি করা হয়েছিল বীরভূমের অনুব্রত বাহিনী। তাদের পারুলিয়া ও পূর্বস্থলীতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। ভোট শুরু হওয়ার পর দুটি নাম্বার প্লেটে কাদা মাখানো পিকাপ ভ্যান ও গোটা কুড়ি বাইকে বাহিনী বেরিয়ে পড়ে অভিযানে। স্থানীয় নেতারা তাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বুথে বুথে। কেউ যাতে চিনতে না পারে তারজন্য তারা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছিল।

সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর বলেন, পূর্বস্থলী-২ পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম সভার মোট আসন ১৫৬টি। মনোয়ন পত্র জমা দিতে বাধা, জোর করে মনোনয়ন প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৩১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। এই বুথগুলির মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি বুথ দখল হয়ে যায় বেলা দশটার মধ্যে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটাররা কোনো সুরক্ষা পায়নি। বিরোধীদের মারধর করে বুথের দখল নিয়ে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে কালনা মহকুমার বাকি চারটি ব্লকেও। প্রতিরোধ করতে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। কালনা হাসপাতালে ভর্তি আছেন পূর্বস্থলী-১ ব্লকের অন্তর্গত বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাহাজদ পুরের নির্দল সমর্থক সারাফত শেখ, কালনা-২ ব্লকের পূর্ব সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্বাসপুরের বিজেপি সমর্থক বাপি নস্কর প্রমুখ। কালনা-১নং ব্লকের ১৩২ নিরলগাছী বুথে পোলিং স্টাফদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভোটদানের সময় শেষ হওয়ার আগেই সরঞ্জাম নিয়ে সেক্টর অফিসে ফিরে যাওয়ায় বহু মানুষ ভোট দিতে পারেননি। এমনকি ব্যালট বক্সে সিল পর্যন্ত করা হয়নি। কালনা-২ ব্লকের ছোট বহরগুলি এলাকা থেকে ছয় জন সশস্ত্র বাইক বাহিনীকে এলাকার মানুষ আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

ভাতাড়ের মুরাতিপুরে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হাতে আহত হয়েছেন সিপিআই(এম) এজেন্ট আকাই শেখ। মেমারির কুটুটের ছোট মশাগড়িয়ায় তৃণমূলীরা ব্যালট বাক্স লুঠ করে ফেলে দিয়েছে। গন্তার-১-এর কবীরপুর গ্রামে ছাপ্পা ভোট প্রতিরোধ করতে গিয়ে ব্যালট বাক্স জলে ফেলেছে।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -9149831839, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা